যায়যায়দিন
তারিখ 03 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

মাধ্যমিক ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প
শিক্ষা ও শিক্ষকতা

বিগত ২৫ ডিসেম্বর ২০০৭-এ পত্রিকায় প্রকাশ পেল-মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্পে ছাত্রী সংখ্যা ব্যাপক হারে কমে যাওয়া এবং উপবৃত্তি লাভের জন্য নতুন নীতিমালা প্রস্তাবের কথা। নারী শিক্ষার প্রসার, নারীদের স্বাবলম্বী করা, নারীর ক্ষমতায়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষাদানে মায়ের ভূমিকা নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি কন্যা সন্তানের প্রতি সমাজে প্রচলিত বহুদিনের অবহেলা দূরীকরণে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্পের গুরুত্ব অনেক।

১৯৯০-এ এই প্রকল্প সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলক এবং ১৯৯৪-এ জাতীয় পর্যায়ে চালু করা হয়। প্রথমে ক্লাস এইট পর্যন্ত ছাত্রীদের এ প্রকল্পের অধীনে উপবৃত্তি দেয়া হয়। এরপর ক্লাস টেন পর্যন্ত এবং বর্তমানে ইন্টারমিডিয়েট ছাত্রীরাও এ প্রকল্পের অধীনে উপবৃত্তি পাচ্ছে।

উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তগুলো হলো ক্লাস টেন পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা, বার্ষিক পরীক্ষায় ৪৫% নাম্বার পাওয়া এবং ৭৫% ক্লাসে হাজিরা থাকা। অথচ এ শর্তগুলো সরকারি প্রচারে মোটেও স্থান পেতো না। সরকারি প্রচারে সব সময় বলা হতো মেয়ে আপনার, পড়ালেখার খরচ সরকারের অথবা প্রতিটি মেয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ বহন করবে সরকার। ফলে মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে যখন শুনেছে এসব শর্তের কথা তখন তারা শিক্ষকদের ওপর হারিয়েছে আস্থা। এলাকার প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাবান লোকদের হাতে এ ব্যাপারে কতো শিক্ষক যে লাঞ্ছিত হয়েছেন তার সঠিক হিসাব হয়তো কেউ রাখেনি। নিজ সন্তানের শিক্ষাদাতা হিসেবে সম্মানীয় শিক্ষক এ উপবৃত্তি প্রকল্পের কারণে অভিভাবকের কাছে হয়েছেন মিথ্যাবাদী, প্রতারক।

অন্যদিকে উপবৃত্তি কার্যক্রমকে দেখাশোনা করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি থানায় একজন করে থানা প্রকল্প কর্মকর্তা (টিপিও) নিয়োগ দেয়া হয়। এ প্রকল্প কর্মকর্তাদের অনেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে এমন ধারণা দেন যার অর্থ অনেকের মতেই হয়তো এ রকম প্রতিষ্ঠানের সব মেয়েরই উপবৃত্তি পাওয়া কাম্য। যেসব মেয়ে উপবৃত্তি পাবে তাদের বেতন সরকার থেকে পাওয়া যাবে আর [illegible]

ধরনের মতামত, সরকারের প্রচারণা, অভিভাবকদের মনোভাব এবং এলাকার প্রভাবশালীদের চাপ ইত্যাদি কারণে শিক্ষকরা পড়েন মহাবিপাকে। অন্যদিকে উপবৃত্তি পাওয়ার আশায় এমন মেয়েও স্কুলে ভর্তি হয় শোনা যায়, যে বর্ণ-পরিচয় জানে না, নিজের নামও লিখতে পারে না। এ ধরনের মেয়ে কি পরীক্ষায় ৪৫% নাম্বার পেতে পারে? এরা কি ক্লাসে ৭৫% হাজির থাকার জন্য ভর্তি হয়? অথচ বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে এদেরই উপবৃত্তির যোগ্য হিসেবে দেখাতে বাধ্য হন

হয়েছে। মনীষী সক্রেটিসের ভাষায় মিথ্যার অপনোদন এবং সত্যের উদঘাটনই শিক্ষা। অথচ এ শিক্ষা দানে জড়িত শিক্ষকরা পদে পদে নিয়েছেন মিথ্যার আশ্রয়। আর এসব কাজ শিক্ষার্থীদের সামনেই সংঘটিত হয়েছে বলে শিক্ষকদের প্রতি তাদের এসেছে অশ্রদ্ধা।

একটি মেয়ে স্কুলের প্রতিটি পরীক্ষায় ৪৫% বা এর বেশি নাম্বার পেলে সে এসএসসি পরীক্ষায় কি ফেল করতে পারে? অথচ স্কুলে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত অনেক মেয়েকেই এসএসসি পরীক্ষায় ফেল

পরীক্ষার খাতা চেক করতেন আর এ খাতাগুলো আসল হওয়ার কারণে এর সঙ্গে নকলগুলোর যথেষ্ট গরমিল থাকতো বলে শিক্ষকরা হতেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাজেহাল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কুলের হয়েছে টাকার শ্রাদ্ধ। (অবশ্য ভালো অফিসার অতি নগণ্য হলেও একেবারে ছিলেন না বা নেই এমন বলা যাবে না।) অথচ এতো যে টাকার শ্রাদ্ধ- এর কি কোনো প্রমাণ আছে?

এ কারণে প্রধান শিক্ষক, স্কুল পরিচালনা পরিষদ, অভিভাবক বা

> এক সময় সমাজে বিচারক আর শিক্ষকরাই সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্য, সামাজিক অবহেলা, জ্ঞানের অগভীরতা, শিক্ষক সুলভ মনোভাবের অভাব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ন্যায়বোধের প্রতি অনীহা ইত্যাদি কারণেই শিক্ষকদের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধার কতোটুকু অবশিষ্ট আছে তা নিয়ে হয়তো অনেক বিতর্ক হতে পারে। তবে এককভাবে উপবৃত্তি কার্যক্রম শিক্ষককে (বিশেষ করে মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক) সাধারণের কাছে যে হাসির পাত্রে পরিণত করেছে তা আর অন্য কিছুই পারেনি এবং এ বিষয়ে বিতর্ক করাটাও মনে হয় খুব সহজ নয়। শিক্ষকের প্রতি এ বিদ্রূপ হাসির ছোয়া কি শিক্ষার গায়েও লাগেনি?

শিক্ষকরা। এ ব্যাপারে শিক্ষক সমাজ বিভিন্নভাবে এ ধরনের মিথ্যা কর্ম থেকে তাদের অব্যাহতি দানের আবেদন-নিবেদন জানিয়ে কোনো লাভ না হলেও সরকারি নীতির বিরোধিতা করার অজুহাতে অপমানিত হয়েছেন। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তৈরি হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই মিথ্যা [illegible]

করতে দেখা যায়। আর এ ব্যাপারে যদি শিক্ষকদের জবাব চাওয়া হয় তারা কি এর জবাব দিতে পারবেন? উপবৃত্তিপ্রাপ্ত কোনো মেয়ে এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করার কারণে কোনো স্কুলকে জবাবদিহি হতে হয়েছে এমন নজির জানা নেই। ২৫ ডিসেম্বর ২০০৭-

সংশ্লিষ্ট অনেকের কাছেই শিক্ষক হয়তো চোর, প্রতারক বলে অনুমিত হয়েছেন। আর মাঝে মধ্যে বড় অঙ্কের টাকার জোগান দিতে শিক্ষার্থীদের দিকেও হয়তো হাত বাড়িয়েছেন। তাহলে উপবৃত্তি পাওয়ার শর্তের ক্ষেত্রে বিরাজিত শৈথিল্য স্কুল শিক্ষক [illegible]

বর্তমানে যেভাবে আছে, এভাবে চলাই ভালো। একে ব্যাপক করতে গেলে নতুন করে শুরু হবে দুর্নীতি। আবার উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের টিউশন ফির স্কুল অংশ সরকার যে হারে দেয়, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তা নির্ধারিত [illegible]

লেখালেখি শুরু হয় তখন থেকেই এ খাতে বিরাজিত অরাজকতা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে মনে হয়। পত্রিকায় প্রকাশ ২০০২-এ যেখানে উপবৃত্তি পায় ৪১ লাখ ৯৩ হাজার ৩৫২ ছাত্রী, সেখানে ২০০৫ সালে এ সংখ্যা দাড়ায় ২২ লাখ ৭০ হাজার ৩৪৩-এ। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপবৃত্তি কার্যক্রমে অনিয়ম অনেকাংশে দূর হলেও নরমাংসের স্বাদ পাওয়া বাঘের মতো এ সংশ্লিষ্ট লোকজনের টাকার নেশা কাটেনি। তাই তারা আজ ভিন্ন নামে, ভিন্নভাবে টাকা উপার্জনে ব্যস্ত বলে শোনা যায়।

বর্তমানে উপবৃত্তি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বিরাজ করলেও একই তারিখের পত্রিকায়ই প্রকাশ নতুন নীতিমালার অধীনে ঐ কার্যক্রম আবার জোরালো হতে যাচ্ছে। বিষয়টি শুনে অনেক শিক্ষককেই উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায়। তারা মনে করেন উপবৃত্তি কার্যক্রম

সামনে এতো অর্থের লেনদেন আর অনিয়ম দেখে তাদের কেউ কেউ যে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েননি বা পড়বেন না তার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবেন না। তারপরও রাষ্ট্র এবং সরকারের কোনো বৃহত্তর প্রয়োজনে একে ব্যাপকতর করতে চাইলে এ কার্যক্রমকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা করে এর অধীনে আলাদা লোক নিয়োগ করে তা পরিচালনা করা উচিত বলে অনেকে মনে করেন।

মনে পড়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন একবার বলেছিলেন, এক সময় সমাজে বিচারক আর শিক্ষকরাই সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্য, সামাজিক অবহেলা, জ্ঞানের অগভীরতা শিক্ষক সুলভ মনোভাবের অভাব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ন্যায়বোধের প্রতি অনীহা ইত্যাদি কারণেই শিক্ষকদের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধার কতোটুকু অবশিষ্ট আছে তা নিয়ে হয়তো অনেক বিতর্ক হতে পারে। তবে এককভাবে উপবৃত্তি কার্যক্রম শিক্ষককে (বিশেষ করে মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক) সাধারণের কাছে যে হাসির পাত্রে পরিণত করেছে তা আর অন্য কিছুই পারেনি এবং এ বিষয়ে বিতর্ক করাটাও মনে হয় খুব সহজ নয়। শিক্ষকের প্রতি এ বিদ্রূপ হাসির ছোয়া কি শিক্ষার গায়েও লাগেনি? তাই আজ সবারই ভাবা উচিত মাধ্যমিক ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম কি এভাবেই চলবে? না বন্ধ হবে, না আরো বেগবান হবে নাকি শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এর সংশ্লিষ্টতা থেকে দূরে রেখেই চালানো হবে।

একজন শিক্ষক